জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ৫ টাকা

প্রকাশকের কথা

লোকসভা ভোটের দামামা বেজে উঠেছে। নানা রঙের বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলি হিসেব-নিকেশ শুরু করে দিয়েছে। এরপরে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু ভোট তো এই প্রথম হচ্ছে না আমাদের দেশে। বহুবার বহুরকম ভোটে জনগণ অংশ নিয়েছেন, তারপরেও জনজীবনের অবস্থা সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। কেন এরকম হল, এর হাত থেকে মুক্তি কোন পথে — সেই আলোচনাই আছে এই পুস্তিকায়।

২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় জামশেদপুর শহরের জি টাউন ক্লাব ময়দানে এক বিরাট সমাবেশের মধ্য দিয়ে। ঐ সভায় আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বক্তব্য রাখেন। সেটাই আমরা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করলাম।

আশা করি, আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণ এই বক্তব্য বিচার করে দেখবেন। অভিনন্দন সহ —

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
কলকাতা ৭০০০১৩

জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে

আপনারা শুনেছেন, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের তৃতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি সমাবেশ ২১-২৫ নভেম্বর ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (২৬ নভেম্বর) জামশেদপুরে তার প্রকাশ্য সমাবেশ। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের বৃহৎ বুর্জোয়া দল বিজেপি, কংগ্রেস, আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল আরজেডি, এসপি, বিএসপি, শিবসেনা, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, এডিএমকে, তেলেগু দেশম, বিজেডি ইত্যাদি এবং বামপন্থী দল সিপিআই (এম), সিপিআই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতিতে। কে দিল্লির কুর্সি রক্ষা করবে, কে দিল্লির কুর্সি দখল করবে, কে কোথায় কার সাথে দরকষাকষি করে কটা সিট পাবে এই নিয়েই হিসেব-নিকেশ, তদবির-তদারকি, তোড়জোড় চলছে। প্রচারে কে কার বিরুদ্ধে কি হাতিয়ার ব্যবহার করবে, ধর্মীয়, জাতপাত-প্রাদেশিকতা-বর্ণ-জনজাতিগত সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে কাকে কিভাবে ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে কাজে লাগাবে - এইসব নিয়েও জোর প্রস্তুতি চলছে। আর পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি তো চলছেই। অন্যদিকে শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরদের সাথেও গোপনে বৈঠক করে যাচ্ছে কে কার কাছ থেকে কত শত কোটি টাকা পাবে নির্বাচনী ফান্ডে। এসব দলই এদের টাকাতেই চলে। প্রতিদিন খবরের কাগজে, টিভিতে এই সব দলের নেতাদের ভাষণ, নানা কাজের ফিরিস্তি; ভবিষ্যতে কী করবেন তার প্রতিশ্রুতি এইসব নিয়েই প্রচার চলছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দলের তৃতীয় কংগ্রেসে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করেছি ভারতবর্ষের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনগণ যাঁরা শোষণে শোষণে জর্জরিত, অত্যাচারিত, তাঁদের নানান জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কীভাবে শ্রেণি সংগ্রাম এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায় এবং আগামী দিনের পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের প্রস্তুতি চালানো যায়। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দলকে আদর্শগত, রাজনীতিগত, নীতি-নৈতিকতাগত এবং সংগঠনগত সমস্ত দিক থেকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, এটাই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, নির্বাচন নয়। আমাদের দল নির্বাচনভিত্তিক দল নয়। আমাদের দল বিপ্লবী দল। আমাদের দল বিশ্বাস করে নির্বাচনের দ্বারা জনগণের কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের

চিন্তাধারার শিক্ষা। বহুদিন আগে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক লেনিন বলেছিলেন, "বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবরণ এবং এটা একবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তখন নির্বাচনের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির, কোনও প্রতিষ্ঠানের বা কোনও পার্টির পরিবর্তনের দ্বারা এই বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে পাল্টানো সম্ভব নয়। ... কয়েক বছর অন্তর শোষকশ্রেণির হয়ে কারা সরকারে বসবে এবং জনগণকে শোষণ-অত্যাচার করবে ইলেকশনের দ্বারা এটাই নির্ধারিত হয়।"[১] কমরেড শিবদাস ঘোষ এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "একটা সরকারের বিরুদ্ধে যখন জনগণ বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে তখন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরেকটা সরকার আসে। সাধারণ মানুষ কতগুলি লোককে অসৎ মনে করে ভাবে সেই লোকগুলিকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য কতগুলি সৎ লোক এসে বসলেই তাদের মঙ্গল হবে। এ ধরনের প্রচার বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা করে থাকে। কাজেই আমি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বলছি, তাঁরা যেন এই ধরনের ভাঁওতায় না ভোলেন। ... ভোটের মারফৎ হাজার বার সরকার পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইনকানুন সংশোধন করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।"[২] তিনি আরও বলেছেন, "ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম এবং শ্রেণিসংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মত সেই দিকে ভেসে যায়।"[৩]

নির্বাচন মানেই ফাঁকা প্রতিশ্রুতির বন্যা

ভারতবর্ষে ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে, বহুদিন কংগ্রেস রাজত্ব করেছে 'গরিবি হঠাও' স্লোগান তুলে এবং বিজেপিও ক্ষমতায় এসেছে 'আচ্ছে দিনে'র প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তার ফল কী হয়েছে, কী হচ্ছে, আপনারা ভুক্তভোগী জনগণ প্রতিদিন দুঃসহ জ্বালায় বুঝছেন। এই দলগুলি প্রত্যেকেই বলছে, তাদের শাসনে দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে, অগ্রগতি ঘটেছে এবং তারা আবার ক্ষমতায় এলে আরও ঘটবে। কিন্তু গোটা দেশের চিত্র কী বলে? সেই সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু তথ্য প্রথম দিকে পড়ে শোনাব, যা আপনারা জানেন নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে

যেটা বাস্তব। এগুলি আমাদের হিসাব নয়, নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার হিসাব। বিশ্বের ১১৯টি ক্ষুধার্ত দেশের মধ্যে ভারতের স্থান আগে ছিল ১০০ নম্বরে। এখন আরও পিছিয়ে হয়েছে ১০৩। এই হচ্ছে অগ্রগতি! এ দেশে প্রতিদিন ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। বিশ্বে যত গরিব আছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ গরিব রয়েছে ভারতে। এ সংখ্যা বাড়ছেই। এ দেশে এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষক ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। প্রতিদিন ৭ হাজার লোক অনাহারে এবং ১০ হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ৩ হাজার শিশু অপুষ্টিতে মারা যায় প্রতিদিন। কিছুকাল আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বলেছেন, এদেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৬১ কোটি। এখন সেটা কত হতে পারে আপনারা বুঝে নিন। এই কিছু দিন আগে রেলে কর্মখালির বিজ্ঞাপনে ৯০ হাজার পোস্টের জন্য আবেদন করেছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ বেকার যুবক। উত্তরপ্রদেশে ৩৬২ টি পিওনের পোস্টের জন্য আবেদন করেছিল ২৩ লক্ষ এবং তার মধ্যে ২৫৫ জন পিএইচ ডি ছাড়াও এম এ, এম এস সি এবং গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করেছেন। পশ্চিমবাংলায় ৫ হাজার ৪০০ গ্রুপ ডি পোস্টের জন্য আবেদন করেছেন ১৮ লক্ষ, এর মধ্যেও পিএইচডি, ডক্টরেট আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন। এই হচ্ছে এ দেশের তীব্র বেকার সঙ্কটের অবস্থা! এই চিত্র গভীর ব্যথা ও উদ্বেগের।

দুই ভারত — দুই চিত্র

অন্যদিকে ভারতের অগ্রগতি কি ঘটেনি? অগ্রগতি ঘটেছে বৃহৎ শিল্পপতিদের, বড় বড় ব্যবসায়ীদের। ২০১৬ সালে এক শতাংশ ধনী ভারতের মোট সম্পদের ৫১ শতাংশের মালিক ছিল। আর দু'বছর বাদে এক শতাংশ ধনীর সম্পদ বাড়তে বাড়তে ৭১ শতাংশ হয়েছে। এখন ভারতে ৯০ ভাগ মানুষের যা সম্পদ সেই পরিমাণ সম্পদ হয়েছে ৫৭ জন কোটিপতির। শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। দিলীপ সিংভির মোট সম্পত্তি ১ লক্ষ ২৮ হাজার ১২২ কোটি টাকা। গৌতম আদানি ১ লক্ষ ৭০ হাজার ২৩০ কোটি, আজিম প্রেমজি ১ লক্ষ ৩০ হাজার ২৫১ কোটি মোট সম্পত্তি, এমনকি বিজেপির প্রেসিডেন্ট অমিত শাহের এই সময়ে সম্পদ বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। আর তার ছেলের সম্পদ বেড়েছে ১৬ হাজার শতাংশ। এমনকী গেরুয়া বসনধারী ব্যবসায়ী বাবা রামদেবেরও সম্পদ বেড়েছে ১৭৩ শতাংশ। এঁরা সকলেই শত শত কোটি টাকার মালিক। এই হচ্ছে আর একটা চিত্র। এছাড়া এইসব দলের মন্ত্রী, এমপি, এমএলএ ও অধিকাংশ নেতা কোটি কোটি টাকার মালিক। তারা জনগণের এত সেবা করেছে যে তাদের এবং আত্মীয় পরিজনদের ধনভাণ্ডার বেড়েই চলেছে, দেশে বিদেশে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সঞ্চিত হচ্ছে।

শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের চুরি-দুর্নীতি এখন প্রায় বৈধ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। করাপশন হ্যাজ বিকাম দি ল অফ দি ল্যান্ড। শুধু পার্থক্য, কে বেশি করেছে, কে কম করেছে, কে ধরা পড়েছে, কে ধরা পড়েনি। ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া সর্বস্তরে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অবস্থা এরা এমন দাঁড় করিয়েছে যে ঘুষ না খাওয়া, দুর্নীতি না করাকে অযোগ্যতা, অপদার্থতা বা পাগলামি বলেই আজকাল গণ্য করা হয়। ব্যাঙ্কগুলির কোটি কোটি টাকা লুঠ করে বিজেপি, কংগ্রেসের দোসর শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা সরকারি মদতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে, আর যত সব ছিঁচকে চোরদের নিয়ে জেল ভরাচ্ছে। সম্প্রতি তেলের উপর ট্যাক্স বাবদ ১০ লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি আয় করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত পাবলিকের গচ্ছিত টাকাতেও সরকার থাবা বসাতে চাইছে।

টাকা নেই এই অজুহাত তুলে শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের টাকা লুটবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। বন্যা-খরা প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেচ ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করছে না, অথচ সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েই চলেছে। অন্যদিকে শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক থেকে ১০ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের ২ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা সরকারি প্রাপ্য ট্যাক্স মকুব করে দিয়েছে। এ পর্যন্ত বিদেশে প্রায় ১০০ লক্ষ কোটি টাকা কালো টাকা হিসাবে সঞ্চয় করতে দিয়েছে। তাহলে এইসব দল কার হয়ে কাজ করছে, একবার ভেবে দেখুন।

ফলে দুই ভারত। এক ভারত বৃহৎ শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ীদের ভারত। তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাড়ছে। আর এক ভারত নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, বেকারদের, যারা আত্মহত্যা করছে, অনাহারে মারা যাচ্ছে, শিশু বিক্রি করছে। এই দলগুলি কোন ভারতের প্রতিনিধি, তা আপনারা বিচার করে দেখুন।

এ ছাড়া ভারতের আরও খবর আছে। আজকের কাগজে বেরিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি গত ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা পৌঁছে দেবে। ১৫ লক্ষ টাকা কেন, ১৫ পয়সাও কেউ পায়নি। আজকের কাগজে বেরিয়েছে সরকার নিযুক্ত তথ্য কমিশন জানতে চেয়েছে কত কালো টাকা উদ্ধার হল? সরকার বলেছে জানাব না, জানানো যায় না। কমিশন জানতে চেয়েছে, কোন কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে, তার লিস্ট দাও। সরকার বলেছে, সেটাও জানানো যাবে না। তথ্য কমিশন আরো জানতে চেয়েছে, বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ করেছে, তার লিস্ট কোথায়? মোদি বলেছেন, সে লিস্টও দেওয়া যাবে না। কারণ পরিষ্কার, সে লিস্টে বিজয় মাল্য, নীরব মোদি, মেহুল চোকসি প্রমুখ বিজেপি নেতাদের বন্ধু রাঘব বোয়ালরা, যারা ব্যাঙ্ক থেকে জনসাধারণের জমানো

কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পালিয়েছে, তাদের নাম আছে। তা হলে এরা কাদের স্বার্থে কাজ করছে সেটা আপনাদের বিচার করে দেখতে হবে।

আজ ভারতবর্ষে চরম দুরবস্থা। শহরগুলিতে ক্ষুধার্ত ভিখারিদের ভিড় বাড়ছে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তাদের আস্তানা শহরের ফুটপাত আর শতছিন্ন চট দিয়ে ঘেরা ঝুপড়ি। দলে দলে প্রতিদিন বেকাররা ঘুরছে কোথায় কোন কাজ পাওয়া যায়, মজুরি যাই হোক, যতক্ষণই খাটতে হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। দু'পয়সা তো পাওয়া যাবে। দুমুঠো তো জুটবে। এই এক চিন্তা, এমনকি দুপয়সা রোজগার করতে গিয়ে এরা বৈধ-অবৈধ খাদানে খাটতে গিয়ে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করতে গিয়ে মরণের ঝুঁকি নিতেও রাজি। মরছেও দলে দলে। গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন, গ্রামগুলি শ্মশান হয়ে গেছে। যুবক-যুবতীরা নেই। কারণ, গ্রামে কোনও কাজ নেই। তারা ছুটছে এই শহর থেকে সেই শহরে। বিদেশেও যাচ্ছে। এদের নাম হচ্ছে মাইগ্র্যান্ট লেবার। কোথাও স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে তাদের কাজ নেই। আপনারা জানেন না, এই দেশের ৩ কোটি ছেলেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে কিছু এজেন্ট। তারা হয়েছে স্লেভ লেবার, দাস শ্রমিক। তাদের দেশেও ফিরতে দিচ্ছে না। তাদের একটু রুটি দেয়। মজুরির কোনও ঠিক নেই, বেরোতে পর্যন্ত দেয় না। একদল ব্যবসায়ী প্রতিদিন হাজার হাজার মেয়েদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসে চাকরি দেওয়ার নাম করে, কোথাও বিয়ে দেবে বলে, তারপর তাদের বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। নারী বিক্রির একটা বিশাল বাজার চলছে এদেশে। এই ২৬ জানুয়ারি আসবে, মহা উৎসব হবে। নেতারা ভাষণ দেবেন। বহু তারাখচিত হোটেলে বিরাট ভোজসভা হবে। সাজসজ্জা হবে, রঙিন আতসবাজি জ্বলবে। নেতা-মন্ত্রীরা খেয়ে উচ্ছিষ্ট ফেলবে ডাস্টবিনে, সেই উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে ফুটপাতের শিশুরা, যারাও মানবসন্তান। লক্ষ লক্ষ শিশু ফুটপাতে জন্মে ফুটপাতেই মারা যায়, কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। এরা জানেও না, এদের বাবা কে, মা কে, কোথায় তাদের ঠিকানা। যখন অন্ধকার নামবে, তখন স্টেশনে, গঞ্জে, শহরে দেখা যাবে আর এক অন্ধকার চিত্র। আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, বিক্রি করবে নিজের দেহ, কিনবে মত্ত মানবদেহী পশুরা। ঘরে অসুস্থ স্বামী, অভুক্ত সন্তান, রোজগার নেই। অনেকে সন্তানও বিক্রি করে দিচ্ছে। এই হচ্ছে দেশের অগ্রগতি! কংগ্রেস দেশ শাসন করেছে দীর্ঘ দিন। তারপর বিজেপির শাসন চলছে। রাজ্যে রাজ্যে অন্য আঞ্চলিক দলগুলি, সিপিএমরাও সরকার চালিয়েছে, চালাচ্ছে। এইভাবে এরা দেশের এই অগ্রগতি ঘটিয়েছে। কার অগ্রগতি ঘটিয়েছে? অগ্রগতি ঘটিয়েছে শিল্পপতিদের, বড় বড় ব্যবসায়ীদের। যারা গরিবের রক্ত-মাংস সব কিছুকে চুষে খায় আর মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এই কি সেই স্বাধীনতা? যে স্বাধীনতার জন্য কিশোর ক্ষুদিরাম প্রাণ দিয়েছিলেন, শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং

প্রাণ দিয়েছিলেন, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র লড়াই করেছিলেন? কেন এমন ঘটল?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পরিবর্তে দেশে চলছে দেশীয় পুঁজিবাদী শোষণ

কারণ বাস্তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পরিবর্তে এসেছে দেশিয় পুঁজিবাদী শোষণ। এ কথাই বলেছেন আমাদের নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছেন, জনগণের স্বাধীনতা আসেনি, এসেছে পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, শোষণের স্বাধীনতা। তিনি বলেছেন, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। একদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণি, যাদের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা, আরও মুনাফা। আর একদিকে কোটি কোটি গরিব মানুষ, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত। তারা শোষিত নির্যাতিত। তারা চায় শোষণমুক্তি। তিনি বলেছেন, রাজনীতি দু'টি, নাম ও ঝাণ্ডার পার্থক্য যাই থাক। একটি হল শিল্পপতিদের রাজনীতি, বড় বড় ব্যবসায়ীদের রাজনীতি, লুণ্ঠনের পক্ষের রাজনীতি, তাদের রক্ষা করার রাজনীতি। এই রাজনীতির পক্ষে বিজেপি, কংগ্রেস সহ সব গদিসর্বস্ব দল। আর একটা রাজনীতি যারা শোষিত জনগণের হয়ে লড়াই করে, সংগ্রাম করে, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেয়। এই রাজনীতির প্রতিনিধি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)— একমাত্র বিপ্লবী দল। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আজ বহু দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ, জ্ঞানের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা চালু করা হচ্ছে। অথচ নবজাগরণের সূচনাকারী রামমোহন রায়, তারপর বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষা নয়, বেদ-বেদান্ত শিক্ষা নয়, চাই বিজ্ঞান, চাই লজিক, চাই বৈজ্ঞানিক দর্শন। বলেছেন, এদেশে নতুন মানুষ গড়তে হলে এই ধরনের শিক্ষা চালু করা উচিত। সকল সংস্কৃত ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যিনি 'বিদ্যাসাগর' পদবী পেয়েছিলেন, তিনিই পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানের সংস্পর্শে এসে নবজাগরণের মশাল জ্বালিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "সাংখ্য-বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন ... ফলে ইউরোপ থেকে এমন দর্শন পড়ানো উচিত, যে দর্শন পড়লে আমাদের দেশের যুবকরা বুঝবে যে বেদান্ত এবং সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন, ... ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামী আরব খলিফার গোড়ামির চেয়েও কম নয়, তাঁদের বিশ্বাস ঋষিদের মস্তিষ্কের থেকে যে শাস্ত্রগুলো বেরিয়েছে - তাঁরা সর্বজ্ঞ। অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত।"[৪] তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকে ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা ছিল না। রামকৃষ্ণ অনুরোধ করা সত্ত্বেও কালীমন্দিরে যাননি। অথচ এসব জেনেও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের সকল বড় মানুষ এই নাস্তিক মহান চরিত্রের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী শুরু হয়েছে,

অথচ কয়জন তাঁকে স্মরণ করে? ভারতীয় নবজাগরণের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আক্রমণ কংগ্রেসই প্রথম শুরু করেছিল, সেই পথে বিজেপি আরও কয়েক ধাপ এগিয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে, যুক্তির চর্চাকে, তর্ক করার মনকে ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য, যাতে কেউ প্রশ্ন না করে, তর্ক না করে, বিরুদ্ধতা না করে, অন্ধের মতো নেতাদের মেনে নেয়। তারা ধর্মীয় শিক্ষা চালু করছে— যাতে মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস থাকে। তারা ধর্মীয় উন্মাদনাও সৃষ্টি করছে।

ভোটের স্বার্থে 'রাম' নিয়ে প্রতিযোগিতা

ভোটের স্বার্থে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে রাম নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে, কে রামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। কে আগে কোন মন্দিরে ধর্ণা দেবে, কত বেশি মন্দিরে যাবে, এ নিয়ে দুই দলের নেতাদের মধ্যে কম্পিটিশন চলছে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে। স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের এসব ভণ্ডামি ছিল না। আজ এই নেতাদের ধর্মভক্তি উথলে পড়ছে। আবার কংগ্রেস নেতারা সব কূল রক্ষা করতে গিয়ে মসজিদে-গির্জাতেও ছুটছে। রাম একটি পৌরাণিক চরিত্র। ইতিহাসে রামকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বুদ্ধদেবকে খুঁজে পাওয়া যায়, মহাবীরকে খুঁজে পাওয়া যায়, শঙ্করাচার্যকে খুঁজে পাওয়া যায়। চার খণ্ড বেদ, ছয় খণ্ড উপনিষদ, গীতা, শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত— কোথাও রামের উল্লেখ নেই। কথিত আছে, রাম জন্মানোর আগেই বাল্মীকি নাকি রামায়ণ রচনা করে রামায়ণ কাহিনীতে ভবিষ্যতে কী কী হবে তা বলে যান। কই সেখানেও তো অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ তৈরির কথা বলা নেই! তুলসীদাসের রামায়ণকে তো ভিত্তি ধরা হয়। সেই সময় তো বাবরি মসজিদ ছিল। তুলসীদাস কি লিখেছেন যে বাবরি মসজিদ হয়েছে রামের জন্মস্থানের উপরে? স্বয়ং বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছেন, "রামায়নের কথাই ধরুন - অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকেই মানিতে হইলেই যে, রামের ন্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যেধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব - নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; হিন্দু ধর্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। কোন পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কত দূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র - এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই।"[৫] তাহলে এই বিবেকানন্দ কি যথার্থই বিশ্বাস করতেন, রামচন্দ্র বলে কেউ ছিল এবং তার জন্মস্থান অযোধ্যায়? বরং তিনি বলেছেন, রাম বা কৃষ্ণ ছিল কিনা, তারা কাল্পনিক না ঐতিহাসিক, এসব নিয়ে মাতামাতি না করে রামায়ণ-মহাভারত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে।

হিন্দুশাস্ত্রে গো-মাংস ভক্ষণ প্রসঙ্গ এবং গোরক্ষণীসভার প্রচারকদের প্রতি বিবেকানন্দ

আমি প্রশ্ন করতে চাই, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ— হিন্দুরা যাঁদের অবতার হিসাবে মানে, তাঁদের সময়েও তো বাবরি মসজিদ ছিল। এঁরা তো কেউ বলেননি রামের জন্মস্থানের উপর বাবরি মসজিদ হয়েছে! এঁরা কি কাপুরুষ ছিলেন যে ভয়ে বলেননি? মন্দির-মসজিদ নিয়ে এই খেলা শুরু করেছিল প্রথম কংগ্রেস। রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে বাবরি মসজিদের তালা খুলে রাম পুজো শুরু করালেন। বিজেপি দেখল মহা বিপদ। অমনি বিজেপি রামচন্দ্র নিয়ে রথযাত্রা শুরু করে দেশে রক্তাক্ত দাঙ্গা বাধাল। স্লোগান তুলল, বাবরি মসজিদ ভাঙতে হবে। তারপর ১৯৯২ সালে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এখন আবার ভোটের আগে ওখানে রামমন্দির তৈরির আওয়াজ তুলে খেলা শুরু করেছে। কিছুদিন ধরে বিজেপি-আরএসএস গোহত্যা বন্ধের জিগির তুলেছে, গোহত্যা ও গরু পাচারের অভিযোগ তুলে বেশ কিছু মানুষকে খুনও করেছে। প্রথমেই আমি প্রশ্ন তুলতে চাই, এটা কি হিন্দু ধর্মের বিধান? তাহলে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কেন এই দাবি তোলেন নি? এঁরা কি হিন্দু ছিলেন না? এবার আমি কয়েকটি শাস্ত্রগ্রন্থ উল্লেখ করতে চাই। ঋকবেদ সংহিতার দশম মন্ডল, ৮৬ সুক্তের চৌদ্দ মন্ত্রে আছে, ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে - "তুমি আমার জন্য ১৫/২০টি বৃষ রান্না করে দাও, আমি তা খেয়ে আমার উদরের দুদিক পূর্ণ করি, আমার শরীর স্থূল করি।"[৬] ঐ বেদেই দশম মন্ডলে ৮৯ সুক্তে চৌদ্দ মন্ত্রে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে - "গোহত্যার স্থানে যেমন গরুরা হত হয়, আমাদের শত্রু রাক্ষসেরা যেন তোমার অস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়ে পৃথিবীতে শয়ন করে।"[৭] বাল্মীকি রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ড ৫৪ সর্গে আছে, বনগমনের পথে রাম-সীতা-লক্ষণ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে মুনিবর বৃষ এবং ফলমূল দিয়ে তাঁদের ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।"[৮] এবার বিজেপি-আরএসএস নেতারা কি ঋকবেদ, বাল্মীকি রামায়ণ পোড়ানোর নিদান দেবেন? আর রাম-লক্ষণ-সীতা ও ভরদ্বাজ মুনির কী শাস্তি বিধান করবেন? প্রাচীনকালে এদেশে সকলের মধ্যেই গোমাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। প্রথম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রাণীহত্যা বন্ধ করায়। তারপর হয়তো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য ব্যবহারিক কারণে গোহত্যা বন্ধ হয়ে যায়। এর সাথে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। তা না হলে বিবেকানন্দ কেন গোরক্ষণীসভার প্রচারকদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন? তারা বিবেকানন্দের কাছে গিয়েছিল কসাইয়ের হাত থেকে গোমাতাদের রক্ষা করে পিঁজরাপোল স্থাপনের উদ্দেশ্যে টাকা চাইবার জন্য। বিবেকানন্দ তাদের প্রশ্ন করেছিলেন, "মধ্য ভারতে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মারা যাচ্ছে, তাদের জন্য ওরা কি উদ্যোগ নিচ্ছেন?" প্রচারক উত্তর দিলেন, "আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের

রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।" বিবেকানন্দ বললেন, "যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হল, সামর্থ সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেন নি?" প্রচারক উত্তর দিয়েছিল, "না, লোকের কর্মফলে-পাপে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যেমন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে।" প্রচারকের কথা শুনে বিবেকানন্দের বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফূরিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি মনের ভাব চেপে বললেন, "যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষী রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। ... কর্মফলে মানুষ মরছে - এরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোনও বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। ... ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে - গোমাতারা নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইয়ের হাতে যাচ্ছেন, মরছেন। আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।" প্রচারক (একটু অপ্রতিভ হইয়া) বলেন, হ্যাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু শাস্ত্র বলে, গরু আমাদের মাতা।" বিবেকানন্দ (হাসিতে হাসিতে) "হ্যাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা বিলক্ষণ বুঝেছি- তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?" কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিবেকানন্দ "কি কথাই বললে, বলে কিনা - কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্য যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?' এই কথা বলতে বলতে স্বামীজীর সর্বাঙ্গ যেন শিহরিত হয়ে উঠিল।" [৯] এখন দেশে অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, এঁদের বাঁচানোর জন্য কোন দলীয় সরকারের কণামাত্র সাহায্য মেলে না, অথচ পাবলিকের ট্যাক্সের টাকায় রাজকোষ থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিজেপি ও কংগ্রেস গোশালা তৈরির কম্পিটিশনে নেমেছে, বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি তে এদের কি বলা চলে, আপনারাই বিচার করে দেখুন।

হিন্দুধর্মের প্রবর্তকদের ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কি?

আমরা মার্কসবাদী, নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু আমি বলতে চাই, ওরা কি হিন্দুধর্ম মানে? অথচ বিবেকানন্দ বলেছেন, "আগে ক্ষুধার্ত মানুষকে রুটি দাও, তারপর ধর্মের কথা বলবে"।[১০] তিনি আরও বলেছেন, "... আমি এমন ভগবানে বিশ্বাস করি না যে আমায় ইহজগতে রুটি দিতে পারে না, কিন্তু স্বর্গে সে আমায় নিত্য মঙ্গল ও চিরন্তন স্বর্গসুখ প্রদান করবে।" এমনকি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য না দিয়ে মন্দির-পূজা এসব নিয়ে বাড়াবাড়িকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেছিলেন, "...ক্রোর

টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিন্ডি করছেন, এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।"[১১] বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, "আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানেই নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই, অথচ সে কাজ করতে হবে বেদ-বাইবেল ও কোরাণকে সমন্বয় করেই। ... আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ... সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একইসময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিষ্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।"[১২] বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ নিজে মসজিদে নামাজ পড়েছেন, গির্জাতে প্রার্থনা করেছেন, আবার কালীপূজাও করেছেন। এঁরা কি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, নাকি আজকের বিজেপি নেতারা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি? এদের প্রশ্ন করুন, এই উন্মাদনা কেন? যখনই ভোট আসে তখনই রামের ধ্বনি ওঠে, রামমন্দিরের স্লোগান ওঠে, তখনই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। এ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

বিজেপির দু'টি লক্ষ্য এখানে কাজ করছে। একটা হল হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। আর একটা লক্ষ্য হচ্ছে, জনগণের ঐক্য ভেঙে দাও। গরিব শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত একে অপরকে ঘৃণা করুক। আমি হিন্দু, তুমি মুসলিম। আমি আপার কাস্ট, তুমি লোয়ার কাস্ট। তুমি দলিত, ও ট্রাইবাল। এই ভাবে জনগণকে বিভক্ত করে দাও, যাতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়তে না পারে। তাই ধর্মভিত্তিক, জাতপাতভিত্তিক বা ট্রাইবভিত্তিক বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো হচ্ছে।

কেন বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে?

আর একটা দিক হচ্ছে, মানুষের মধ্যে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস জাগিয়ে দাও। তুমি গরিব কেন, বেকার কেন এই সব প্রশ্নের উত্তরে বোঝাও— তোমার অদৃষ্ট খারাপ, কপালের দোষ, পূর্বজন্মের পাপের ফল। যেন এই আম্বানি, আদানি প্রমুখ যারা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটছে, শোষণ করছে, এরা পূর্বজন্মে এত পূণ্য করেছে যে ভগবান ওদের পাঠিয়েছে গরিবের রক্ত চুষে খেয়ে মারার জন্য। এই জন্য ওদের ভগবানের দরকার। আর গরিবকে বোঝানো, তুমি হাসি মুখে না খেয়ে মরো, বিনা চিকিৎসায় মরো, এ তোমার পাপের ফল। বিনা প্রতিবাদে এজন্মে হাসিমুখে সহ্য করলে পরজন্মে পরিত্রাণ পাবে। কেন এই সব শোষণ-অত্যাচার হচ্ছে তার উত্তর খুঁজো না। খোদা কা মর্জি, নসিব কা খেল। তাই সকল দুঃখকষ্ট, অন্যায়-অত্যাচারের জন্য অন্য কাউকে নয়, নিজের পূর্বজন্মের পাপ আর অদৃষ্টকে দায়ী করো! এইজন্য বোঝানো হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞান নতুন কিছু আবিষ্কার করেনি,

সবই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে মুনিঋষিরা আবিষ্কার করে গেছেন, যাতে বিজ্ঞানবিরোধী মানসিকতা তৈরি করে অন্ধ ধর্মীয় মানসিকতা জাগানো যায়। অথচ সত্য জানার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকার জন্য দেশত্যাগের আগে আলিপুর জেলের অনশনরত অবস্থায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছাত্র-যুবকদের আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, "...পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপের প্রশ্নে, অদ্যাবধি বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি, তা জেনে আমাদের খোলা মনে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য প্রকট হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে আমাদের মনে রাখা উচিত, বস্তুবাদ সম্পর্কে আগেকার ধারনা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তি ও অনুমান, এই দুইয়ের আক্রমণে তা পর্যুদস্ত।"[১৩] নেতাজীর এই আবেদন দেশের ছাত্র, যুবক, সকলকেই স্মরণ করতে হবে।

কারা যথার্থ দেশপ্রেমিক?

অন্যদিকে যে বিজেপি- আরএসএস আজ নিজেদের 'দেশপ্রেমিক' বলে ঢাক পেটাচ্ছে, তাদের অতীত ইতিহাস কি বলে? যখন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছাত্রযুবক-জনগণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে লড়াই করেছে, বুকের রক্ত ঢেলেছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তখন বিজেপি'র জনক আরএসএস-এর কি ভূমিকা ছিল? তারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করে একে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছিল। ওদের গুরু গোলওয়ালকর সেদিন বলেছিলেন, "আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের যে ধারণা অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তা ও সাধারণ শত্রু (ব্রিটিশ) কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সেটা আমাদের যথার্থ প্রেরণাদায়ক হিন্দু জাতীয়তাবাদের সদর্থক ধারনা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করেছে। ব্রিটিশ বিরোধিতাকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারনা আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতাদের ও জনগণের উপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছে। ... তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা তাদের অন্তরে হিন্দু জাতির গৌরব পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দু জাতির স্বার্থহানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু।"[১৪] আরএসএস-এর এই গুরুর বক্তব্য অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক ছিল না, হিন্দু জাতীয়তাবাদই যথার্থ ছিল। যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করেছিলেন, সেইসব নেতারা ও জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল ধারনা নিয়ে চলেছিলেন। এই কারণে আরএসএস, সেই যুগে স্বাধীনতা আন্দোলন বয়কট করেছিল। আরএসএস-এর এই বক্তব্য অনুযায়ী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা

দেশবন্ধু, নেতাজী, তিলক, লালা লাজপত, গান্ধিজী থেকে শুরু করে শহীদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেনরা প্রকৃত দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না, প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। এইসব প্রশ্ন ওঠায় বর্তমান আরএসএস প্রধান ঘোষণা করেছেন যে, তারা গুরুজীর বক্তব্য থেকে এই অংশ বাদ দেবেন। এখন বাদ দিয়ে দেশবাসীকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে তাদের এই কলঙ্কজনক ভূমিকা কি ইতিহাস থেকে মুছতে পারবেন? এদের এই ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক করে সেদিন নেতাজী যথার্থই বলেছিলেন, "... হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া হিন্দুরাজের ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। ... একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থলোভে (হিন্দু-মুসলিম) উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে — স্বাধীনতা সংগ্রামে এ শ্রেণির লোককেও শত্রু গণ্য করা প্রয়োজন।"[১৫] অনেকেই এটা জানে না যে আরএসএস ১৯৪২ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানে যোগ না দেওয়ায় তৎকালীন বোম্বাইয়ের ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব তাদের প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। আর আজ এই আরএসএস-বিজেপি'ই দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট বিলি করছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনই ধর্মগত-ভাষাগত-বর্ণগত-জনজাতিগত ও প্রাদেশিকতার বিরোধ ও অত্যাচারের অবসান ঘটাতে পারে

আরেকটা বিষয়েও আপনাদের সতর্ক করা দরকার। বিজেপি, কংগ্রেস নেতারা দুইবেলা চোখের জল বর্ষণের কম্পিটিশন দিচ্ছে দলিত ও জনজাতিদের জন্য, আর নানারকম রঙিন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বিজেপি যেমন সরাসরি হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে দাঁড়িয়েছে, কংগ্রেস অন্যদিকে 'নরম হিন্দুত্ব' চর্চা করছে ও সংখ্যালঘুদের 'ত্রাতা' বলে দাবি করছে। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা অপমানিত ও নির্যাতিত 'নিম্নবর্ণের' হিন্দুদের নানা খণ্ডের রক্ষাকর্তা হিসাবে, সংখ্যালঘুদের রক্ষাকর্তা হিসাবে, বহিরাগত আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত পাহাড়ী বনাঞ্চলে আশ্রিত জনজাতিদের রক্ষাকর্তা হিসাবে এবং নানা প্রাদেশিক ও ভাষাভাষী স্বার্থের রক্ষক হিসাবে বহু আঞ্চলিক দলও বেশ কিছুদিন ধরে মাথাচাড়া দিয়েছে। এসবের কারণ, একদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন আপোসকামী বুর্জোয়াশ্রেণি কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার মানবতাবাদের ভিত্তিতে সংগ্রাম চালায়নি, মধ্যযুগীয় চিন্তা-সংস্কৃতি ও ভেদাভেদের স্বার্থে আপোস করে এগুলিকে টিকিয়ে রেখেছে, মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, যার ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ও মুসলিমদের প্রধান অংশ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়নি, জনজাতিদের ও অনুন্নত প্রাদেশিক ভাষাভাষীদেরও অংশগ্রহণ করানো হয়নি। যার

ফলে রাজনৈতিকভাবে একধরনের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠলেও উপজাতি-ধর্ম-বর্ণ-জনজাতি নির্বিশেষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে জনজীবনের সকল সঙ্কটের মূল কারণ যে পুঁজিবাদ এটা যাতে সকল স্তরের শোষিত জনগণ না বুঝতে পারে এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তার জন্য এইভাবে বিভক্ত জনগণকে পুঁজিপতিশ্রেণি ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলি একের বিরুদ্ধে অপরকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করাচ্ছে, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের আগুন জ্বালাচ্ছে, বিজেপি ও কংগ্রেস এই বিভাগকে ভোটব্যাঙ্ক হিসাবেও ব্যবহার করছে। আবার এইসব গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষক দাবিদার একদল নেতানেত্রী ও দল গড়ে উঠছে, যারাও এদের জন্য চোখের জল ফেলছে, নিজেরা এমএলএ, এমপি হচ্ছে, অন্য বৃহৎ বুর্জোয়া দলগুলির সাথে বারগেইন করে মন্ত্রীত্বের গদি দখল, প্রচুর অর্থ ও সম্পদের মালিক হচ্ছে, মুখে না বললেও তারা চায় এদের উপর অত্যাচার চলুক, আরও বাড়ুক, যাতে এদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এই স্বার্থান্বেষী দলগুলি ও নেতারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে পারে। তারাও এদের বোঝাতে দিতে চায় না যে, শুধু অর্থনৈতিক শোষণই নয়, সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক শোষণের জন্যও দায়ি বর্তমান ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদ। ফলে একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মুক্তি সংগ্রামই ধর্মগত-ভাষাগত-বর্ণগত-জনজাতিগত-প্রাদেশিকতাগত পার্থক্য-বিরোধ-অত্যাচার-অবিচারের অবসান ঘটাতে পারে। এটা এদের বোঝাতে হবে। না হলে বুর্জোয়া দলগুলি এদের বারবার উলুখড়ের মত ব্যবহার করবে নানা প্রলোভন দেখিয়ে আর এদের গোষ্ঠী থেকে গজিয়ে ওটা নেতানেত্রীরা 'ত্রাতা' সেজে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবে আর এদের মধ্যে সাধারণ গরিব মানুষ অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মরতে থাকবে, অপমানিত-লাঞ্ছিত হতে থাকবে।

দেশের মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টা

আর একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলছে। এদেশে যখন ব্রিটিশ শাসকরা চেয়েছিল এ দেশের ছাত্র-যুবকরা নোকর হোক, গোলাম হোক। সেই সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিল অসংখ্য ছাত্র-যুবক-যুবতী, যারা হাসতে হাসতে শিক্ষা বর্জন করেছে, চাকরি বর্জন করেছে, ঘর-সংসারের দিকে তাকায়নি, জেলে গেছে, লাঠি খেয়েছে, গুলি খেয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। সেই দিন ছিল যথার্থ যৌবন। আজ এ দেশের শাসকরা যৌবনকে ধ্বংস করছে। মদ খাও, জুয়া খেল, সাট্টা খেল, ড্রাগের নেশায় মত্ত থাকো, আর নারীদেহ নিয়ে কুৎসিত নোংরামিতে মত্ত থাকো - চতুর্দিকেই তার অঢেল আয়োজন শাসকদের ষড়যন্ত্রে। ব্লু-ফিল্ম, টিভির মাধ্যমে কত নোংরা প্রচার করাছে। ভেবে দেখুন, ছ'মাসের শিশুকন্যা, দু'বছরের শিশুকন্যা,

তাকেও ধর্ষণ করা হচ্ছে। একবার ভেবে দেখুন, পশ্চিম বাংলার নদিয়ার একশো বছরের বৃদ্ধা মহিলাকে মত্ত অবস্থায় এক যুবক ধর্ষণ করেছে। জন্মদাতা বাবার বিরুদ্ধে মেয়ে অভিযোগ করছে, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী অভিযোগ করছে। কোন দেশে আমরা বাস করছি! দয়ামায়া, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সব ধ্বংস করে দিচ্ছে, বৃদ্ধ বাবা-মাকে সন্তান ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, খুন করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে। এই তো দেশের অগ্রগতি! ধর্ষণ, গণধর্ষণ পশুরাও করে না। পুঁজিপতি শ্রেণি দেশের যুবকদের এই দিকে ঠেলছে কেন? যাতে যুবকদের যৌবন মরে যায়, বিবেক মরে যায়, মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়, তারা অমানুষ হয়, যাতে তারা শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে, প্রতিবাদ-লড়াই করতে না পারে, আর যাতে তাদের টাকা দিয়ে কেনা যায়, যে কোনও অমানুষের কাজ করানো যায়। দেশের ছাত্রযুব শক্তিকে অমানুষ বানাতে পারলে নেতারাও নিশ্চিন্তে অমানুষের মত কাজ করতে পারে। এই যে ভোট আসছে, বেকার যুবকরা মদ খাওয়ার জন্য, নেশা করার জন্য, ফূর্তি করার জন্য হয় বিজেপির ভলান্টিয়ার হবে, না হয় কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হবে, না হলে অন্য আঞ্চলিক দলের কাজ করবে, টাকা কামাবে। যে বেশি দেবে, তার হয়ে কাজ করবে। তাই আজ দেশে সুভাষচন্দ্র নিয়ে কোনও চর্চা, শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লাদের নিয়ে কোনও চর্চা নেই, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, সূর্য সেনকে নিয়ে চর্চা নেই। এ দেশের মানুষ রামমোহন বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে না, এ দেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মণিয়ম ভারতীদের স্মরণ করে না। শাসকরা এঁদের গৌরবময় স্মৃতি অবলুপ্ত করেছে। তারা চায়, এঁদের ভুলে যাও, অমানুষ হও, মনুষ্যত্বহীন হও। তা হলেই তারা নিশ্চিন্ত। এই হচ্ছে পুঁজিবাদের আক্রমণ, এই হচ্ছে পুঁজিবাদের গোলাম এই দলগুলির আক্রমণ।

আজ দেশের যে পরিস্থিতি, গোটা দেশে যা হচ্ছে, একবার ভেবে দেখুন— আজ যদি বিদ্যাসাগর থাকতেন, আজ যদি জ্যোতিবারাও ফুলে থাকতেন, বিবেকানন্দ থাকতেন, যদি দেশবন্ধু, লালা লাজপৎ রাই থাকতেন, যদি সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং থাকতেন, তা হলে তাঁরা দেশের মানুষকে কী বলতেন? বলতেন কি কংগ্রেস-বিজেপির গোলামি কর, মসজিদ ধ্বংস করে মন্দির তৈরি কর? বলতেন কি মদ খাও, নেশা কর? নারীদেহ নিয়ে নোংরামি কর? নাকি বলতেন, এর বিরুদ্ধে লড়াই কর, মনুষ্যত্ব নিয়ে দাঁড়াও। একমাত্র আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আবার এ দেশের মনুষ্যত্বকে যৌবনকে জাগাবার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে এইসব বড় মানুষ ও শহিদদের গৌরবময় সংগ্রামী জীবনকে স্মরণ করিয়ে, যে স্মৃতিকে এই দলগুলি ও পুঁজিপতি শ্রেণি মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে।

বুর্জোয়া নেতাদের দুর্নীতি ও মূল্যবোধহীনতার কারণ কী ও সমাধান কোন পথে

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের মানুষ 'স্বদেশী' আখ্যা দিয়ে শ্রদ্ধা করত, তখনকার রাজনীতিকে মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "দেশসেবা কথার কথা নয়। দেশসেবা মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা, স্বার্থ-গন্ধ থাকবে না, নাম-যশের আকাঙ্খা থাকবে না, প্রাণের ভয় পর্যন্ত থাকবে না, একদিকে দেশসেবক নিজে, আর দিকে তার দেশ, মাঝে আর কিছু থাকবে না। যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ-পূণ্য, ভাল-মন্দ, সব যে দেশের জন্য বলি দিতে পারবে, দেশসেবা তার দ্বারাই হবে।"[১৬] স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে দেশসেবকরা তাই ছিলেন। আর আজকের দিনে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, এসপি, বিএসপি, আরজেডি, জেডিইউ, শিবসেনা, এনসিপি, তেলেগু দেশম, ডিএমকে, এডিএমকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, এমনকি সিপিএম ইত্যাদি দলের নেতাদের দেখলে কোন ভক্তিশ্রদ্ধা জাগে? বিশ্বাস হয়? এদের এই অধঃপতনের কারণ কি? প্রায় এদের সকলের বিরুদ্ধেই কেন দুর্নীতি, অসততার অভিযোগ উঠছে? এই প্রশ্নের যথাযথ ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে, যেকোন শোষক-শোষিত শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যেকোন ব্যক্তির চরিত্র নির্ভর করে, সেই ব্যক্তি অত্যাচারী শোষক বা অত্যাচারিত শোষিত কোন শ্রেণির স্বার্থের রক্ষক বা স্বার্থের পক্ষে জানিত বা অজানিত ভূমিকা পালন করছে, তার উপর। একসময় অত্যাচারী দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত দাসদের মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ধর্মীয় চিন্তা এসেছিল। মানবকল্যাণে ধর্ম সেদিন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে ন্যায়-অন্যায়বোধ এনেছিল, ধর্মপ্রচারকেরা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা বড় মানুষ ছিলেন, তাঁরা শোষকশ্রেণির দ্বারা অত্যাচারিত-নির্যাতিত হয়েছিলেন, অনেককেই নৃশংসভাবে হত্যা করাও হয়েছিল। এইসময়ই ধর্ম উন্নত মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের পথপ্রদর্শন করেছিল। ধর্মভিত্তিক শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্র পরবর্তীকালে দাসপ্রথার পরিবর্তে এসেছিল এবং কালক্রমে ধর্ম যখন রাজতন্ত্র কর্তৃক প্রজাদের নিপীড়নের, সামন্ততন্ত্র কর্তৃক ভূমিদাসদের অত্যাচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন ধর্ম পূর্বতন প্রগতিশীল ভূমিকা হারায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে অত্যাচারীর সহায়কের ভূমিকা নেয়, তখন থেকেই ধর্ম কর্তৃক মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের পথপ্রদর্শনের ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাই আজ দেখুন, ধর্মকে নিয়ে কোনও বড় চরিত্র জন্ম নিচ্ছে না। সমাজে এত অন্যায়-অত্যাচার-পাপ হচ্ছে, কোন ধর্মই প্রতিবাদ-সংগ্রাম করছে না। বরং সবকিছুই 'ঈশ্বরের বিধান' বলে মানুষকে আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ রাখছে, অধিকাংশ ধর্মীয় প্রধানরা ও প্রতিষ্ঠানগুলি বিপুল সম্পদের মালিক এবং দুর্নীতি ও অনাচারের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আবার অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

আহ্বান জানিয়ে উদীয়মান পুঁজিবাদ যখন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার মানবতাবাদ, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, সাম্য-মৈত্রি-স্বাধীনতার বাণী নিয়ে প্রথমে নবজাগরণের সূচনা করেছিল এবং পরে ভূমিদাসদের সংগঠিত করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিল, তখন সামন্ত্রতান্ত্রিক অ্যাবসলিউট মালিকানার পরিবর্তে যেকোন ব্যক্তিই সম্পত্তি বা সম্পদের মালিক হতে পারে, রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপন ও ব্যক্তির মত প্রকাশেরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে — এরই ভিত্তিতে সেদিন বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ সামাজিক স্বার্থেই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। দেশে দেশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ ব্যক্তিকে উন্নত চরিত্রের ও মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পুঁজিবাদ যখন পরবর্তীস্তরে চুড়ান্ত শোষকে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়, একচেটিয়া পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়, সামাজিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রমিক শোষণের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের স্বার্থই পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানার চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে নির্ধারিত হয়, তখন বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ সামাজিক স্বার্থবিরোধী মূল্যবোধবর্জিত চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হয়ে মনুষ্যত্ব ও চরিত্রকে ধ্বংস করতে থাকে। তাই একদিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে যে পুঁজিবাদ কত মহান চরিত্র ও বড় মানুষের জন্ম দিয়েছিল, আজ সেই পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল যুগে তার গোলামি করা রাজনীতিকরা চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত, ভণ্ড, অসৎ, প্রতারক ও মিথ্যাচারীতে পরিণত হয়েছে। পুঁজিপতিদের যেমন একমাত্র লক্ষ্য নিজ দেশে, পরদেশে কোন ন্যায়নীতির পরোয়া না করে শ্রমিক শোষণ করে, লুণ্ঠন করে কত মুনাফা অর্জন করতে পারে, পুঁজিবাদের গোলাম এই রাজনীতিবিদদেরও একমাত্র ধান্দা কিভাবে পুঁজিপতিদের তুষ্ট করে তাদের আশীর্বাদ অর্জন করে জনগণকে ঠকিয়ে, মিথ্যা স্তোক দিয়ে এমএলএ, এমপি ও মন্ত্রী হতে পারে, কোটি কোটি টাকা কামাতে পারে। ফলে মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের নিয়মেই পুঁজিবাদী পথে অনিবার্যভাবেই এই রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচারী, ঠগবাজ হচ্ছে ও হতে বাধ্য। আজকের দিনে কেবল পুঁজিবাদবিরোধী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি উন্নত চরিত্র ও মনুষ্যত্বের সন্ধান দিতে পারে। আমাদের দলকে যাঁরা জানেন, চেনেন, তাঁরা যে মনে করেন একমাত্র আমাদের দলের কর্মীরাই সৎ, ভদ্র, চরিত্রবান, সুশৃঙ্খল, নীতি-আদর্শপরায়ন, তাঁদের বুঝতে হবে আজকের এই সর্বাত্মক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে এরা কিভাবে গড়ে উঠল? এদের গড়ে ওঠার প্রেরণা কি? এই প্রেরণা হচ্ছে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত বিপ্লবী মতবাদ ও উন্নত চরিত্রের মান। তিনি বলেছেন, "উন্নত চরিত্রের মান বিপ্লবী চরিত্রের প্রাণ।" এজন্য আমাদের দলের সর্বস্তরে বিপ্লবী জ্ঞান আয়ত্ত্ব করার চর্চা ও উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র

অর্জনের সাধনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে দেশের রাজনীতির এই হাল দেখে তিতিবিরক্ত হয়ে 'সব দলই সমান', 'পলিটিশিয়ানরা সবাই ধান্দাবাজ' - এসব বলে সরে গেলে চলবে না। রাজনীতিই দেশ-প্রশাসন, আপনাদের জীবনের সবকিছু নির্ধারণ করছে, আপনি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতি আপনাকে ছাড়বে না। আর 'দেশে মানুষ নেই, চরিত্র নেই, সবাই ধান্দাবাজ' - এ নিয়ে হাহুতাশ করলেও কিছু হবে না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়ে, আর্থিক লোভে বা সংবাদমাধ্যমের হাওয়ায় ভেসে এদিক-ওদিক ছুটে, কখনও এই দলের পিছনে, কখনও ঐ দলের পিছনে ছুটেও লাভ হবে না। শোষিতশ্রেণি হিসাবে আপনাদের বুঝতে হবে আপনাদের শ্রেণিস্বার্থ কি, পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন দল শ্রেণিসংগ্রাম, গণআন্দোলন ও বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করছে, যথার্থ মনুষ্যত্ব ও উন্নত চরিত্রের পথপ্রদর্শন করছে।

ভোটের স্বার্থে কংগ্রেসকে সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক তকমা দিচ্ছে সিপিএম

আমরা নির্বাচনে নামব। কিন্তু বিপ্লবী আদর্শ ও বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। আমরা সিপিআই-সিপিএমের মতো কংগ্রেসকে 'সেকুলার' তকমা লাগাই না। সেকুলারিজম কথাটার বিরাট তাৎপর্য আছে। দর্শনগত ভাবে সেকুলারিজম মানে হচ্ছে, পার্থিব জগৎই সত্য। এর বাইরে কোনও ঐশ্বরিক শক্তি নেই। রাজনৈতিক অর্থে সেকুলারিজম হচ্ছে, সুভাষচন্দ্রে ভাষায় বলতে গেলে, "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ... ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয় দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা।"[১৭] ভগৎ সিং এই সেকুলারিজমকে সমর্থন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দ-নজরুলরা এই সেকুলারিজমের কথা বলেছিলেন। আর কংগ্রেস প্রথম থেকেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলেছে। গান্ধীজি এ কথা বলেছিলেন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে, যাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা না হয়, শোষিত জনগণ যাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত না হয়। এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ করতে গিয়ে তা হিন্দু ধর্মভিত্তিক, বিশেষত হিন্দুউচ্চবর্ণভিত্তিক হয়ে গেল। তার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান সৃষ্টি করালো, না হলে এই সর্বনাশ হত না। ফলে, কংগ্রেস কোনওদিনই সেকুলার ছিল না, আজও নয়। ভোটের ময়দানে বিজেপির বিরোধিতা করছে বলেই কংগ্রেস সেকুলার— এসব মিথ্যা কথা বলে সিপিএম-সিপিআই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করছে নিছক ভোটের স্বার্থে, কয়েকটা সিট পাওয়ার জন্য। আমরা এই রাজনীতির চর্চা করি না। বিজেপি

যেমন দাঙ্গা বাধিয়ে দেশের মাটিকে বারবার রক্তাক্ত করেছে, গণহত্যা করেছে, তেমন কংগ্রেসও কি করেনি? ওড়িশার রাউরকেল্লায়, বিহারের ভাগলপুরে, আসামের নেলিতে, দিল্লিতে কে দাঙ্গা বাধিয়েছিল? কংগ্রেসই তো! আবার ওরা কংগ্রেসের গায়ে 'গণতান্ত্রিক' তকমা লাগাচ্ছে। এই কংগ্রেসই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে থাকাকালীন আন্দোলন দমনে কত শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবকের রক্ত ঝরিয়েছে, প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এই কংগ্রেসই তো জরুরি অবস্থা জারি করেছে, টাডা, মিসা, এসমা প্রভৃতি কালা আইন চালু করেছে। নিছক ভোটের স্বার্থে বামপন্থাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার নামে কংগ্রেসের গায়ে 'সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক' লেবেল লাগাচ্ছে, যেমন একই ভাবে ১৯৭৭ সালে এই সিপিএম-ই কংগ্রেসের 'স্বৈরাচার বিরোধিতা'র নামে জনসংঘ- আরএসএস নিয়ে গঠিত জনতা পার্টির সাথে হাত মিলিয়েছিল। এরপরও বিজেপি-সিপিএম হাত মিলিয়ে ভিপি সিংকে প্রধানমন্ত্রীত্বে বসিয়েছিল। এর সাথে বিপ্লবী রাজনীতি তো দূরের কথা, বামপন্থার কোন সম্পর্ক নেই। এ হচ্ছে নির্বাচনী স্বার্থে নিছক সুবিধাবাদ। এইসব করে করে তারা বামপন্থী আন্দোলনের অনেক সর্বনাশ করেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনেও অবিভক্ত সিপিআই-এর মার্কসবাদবিরোধী ভূমিকা

আমরা সব সময়ই বলেছি, সিপিএম-সিপিআই মার্কসবাদের কথা বললেও, ওরা যথার্থ মাকর্সবাদী দল নয়। ওদের অতীত ইতিহাস তা বলে না। স্বাধীনতা আন্দোলনেও ওদের ভূমিকা মার্কসবাদসম্মত ছিল না। আপনারা অনেকেই জানেন না, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এদেশের বুর্জোয়া শ্রেণি গান্ধিজিকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল করার ষড়যন্ত্র করেছে। বিপ্লবী আন্দোলনকে আটকেছে শান্তিপূর্ণ পন্থার নামে। আরেকটা ধারা ছিল, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, ক্ষুদিরামের ধারা, চন্দ্রশেখর আজাদের ধারা— সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা। এ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই ধারাকে বিপদের চোখে দেখেছিল। যার জন্য ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে গান্ধিজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-ভারতীয় পুঁজিবাদ ও গান্ধিবাদীদের ষড়যন্ত্রে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর এই মহান দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। কারণ তিনি মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আপোসহীন সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছিলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের সমর্থক ছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকদের সামিল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, জমিদারি প্রথার অবসান দাবি করেছিলেন এবং সেইসময়ই ভারতীয় পুঁজিপতি টাটা ও অন্যদের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন

করেছিলেন। ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন সিপিআই নেতাদের গাইডলাইন দিয়ে বলেছিলেন, "ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা আপোসকামী ও বিপ্লবী শক্তিতে বিভক্ত হয়েছে এবং বুর্জোয়াদের আপোসকামী অংশ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে চুক্তি করেছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের থেকেও বিপ্লবকে বেশি ভয় করে এবং দেশের স্বার্থের থেকেও মুনাফার স্বার্থকে বড় গণ্য করে। বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী এই অংশ বিপ্লবের চরম শত্রুশিবিরে সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে এবং নিজ দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সাথে জোট করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গ্রাম ও শহরের পেটিবুর্জোয়াদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশের সাথে প্রকাশ্যে জোট গঠন করে আপোসকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে।"[১৮] কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সিপিআই তা করেনি। সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করে বারবার আপোসকামী গান্ধিবাদীদের সমর্থন করেছে। দক্ষিণপন্থী গান্ধিবাদীদের বিকল্প হিসাবে বামপন্থী শক্তিকে সংহত করার জন্য ঝাড়খণ্ডের রামগড়ে সুভাষচন্দ্র যে বামপন্থী সম্মেলন করেছিলেন, সিপিআই-কে তিনি অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা যোগ দেয়নি। এতে এক বিরাট সম্ভাবনা নষ্ট হয়। মহান মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি যেমন সেই দেশের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা ডঃ সান ইয়াৎ সেনকে সামনে রেখে বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করেছিলেন, তেমনি এদেশে নেতাজীকে সামনে রেখে একই কাজ করা যেত। কিন্তু সেই পথে তাঁরা যাননি মহান স্ট্যালিনের গাইডলাইনকে অগ্রাহ্য করে। একইভাবে তারা ১৯৪২ সালে আগস্ট অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছিল, যার জন্য ১৯৫২ সালে স্ট্যালিন সিপিআই নেতাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন, ওদের সেই যুগের নেতা ডঃ রণেন সেন তাঁর একটি বইয়ে এটা লিখেছেন।[১৯] এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, সুভাষ বসুকে যদি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করানো ও বহিষ্কার করা না হত এবং সিপিআই যদি তাঁর বামপন্থাকে সংহত করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে শক্তিশালী করত, তাহলে তিনি হয়ত দেশের বাইরে যেতেন না। দেশের ভিতরে থেকে তিনিই তখন ১৯৪২ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী বামপন্থী ধারা প্রাধান্য পেত, ইতিহাস অন্যরকম হত। তারা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াইকে এবং সুভাষচন্দ্রকে 'জাপানের দালাল' বলেও. অভিহিত করেছিল। শুধু তাই নয়, অবিভক্ত সিপিআই নেতৃত্ব হিন্দু ও মুসলিম আলাদা দুই জাতি— এই বিচিত্র তত্ত্ব খাড়া করে সেদিন হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ, আরএসএস-এর মতোই দেশভাগ সমর্থন করেছিল।এইভাবে প্রতিক্ষেত্রেই তারা মার্কসবাদবিরোধী কার্যকলাপ করেছে। এই অবিভক্ত সিপিআই-এর ঐতিহ্যই বর্তমান সিপিএম, সিপিআই, নকশালরা বহন করছে।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম মার্কসবাদ ও বামপন্থাকে কলুষিত করেছে

পশ্চিমবঙ্গ এক সময় ভারতের বামপন্থার পীঠস্থান ছিল। সেই অবিভক্ত বাংলা সুভাষচন্দ্রের ঐতিহ্য বহন করেছে, এখানে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রভাবও বামপন্থাকে শক্তিশালী করেছে। এখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, ছাত্র-যুবকদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ছিল না বলতে গেলে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম চৌত্রিশ বছরের শাসনে বামপন্থাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মাল্টিন্যাশনাল ও দেশিয় পুঁজিপতিবিরোধী আন্দোলন দমনে নৃশংসভাবে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক হত্যা করেছিল, পুলিশ-প্রশাসন সকল প্রতিষ্ঠানে নিরঙ্কুশ দলীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে, ক্রিমিনালদের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিল, তোলাবাজি-দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে, লাইসেন্স পারমিট-কন্ট্র্যাক্টরি-চাকরির সুযোগ দিয়ে এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে, ভোটে ব্যাপক রিগিং করে আধিপত্য কায়েম করেছিল। অথচ এরাজ্যে বামপন্থার এমন প্রভাব ছিল যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মত ব্যক্তিও হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ খাড়া করতে পারেননি। লক্ষ্যণীয় যে সিপিএম তাদের কর্মী সমর্থকদের এমন বামপন্থা বুঝিয়েছিল যে, তাদের একটা বিরাট অংশ সরকারি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দলে দলে বিজেপি ও তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় সিপিএম এরাজ্যে ভোটে তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এখন কংগ্রেসের হাত ধরে দ্বিতীয় শক্তি হওয়ার চেষ্টা করছে এবং পুনরায় হারানো রাজত্ব ফিরে পাওয়ার আশা জাগিয়ে মনমরা কর্মীদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে। এই তো ওদের বামপন্থা! এই প্রসঙ্গে ১৯৬৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি অতি প্রাসঙ্গিক হুঁশিয়ারী উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন, "এই পরিস্থিতিতে জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওঁত পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। একথাটা ক্ষমতাসীন সিপিএম নেতারা বুঝছেন না, তাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ, মূল তত্ত্ব বাদ দিয়ে প্রায় কংগ্রেসের মতো বড় বড় বুকনি আর মিষ্টি কথার চালাকিতে জনতাকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। এইভাবে কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন।"[২০] সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকদের এইসব বক্তব্য ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

তৃণমূলের শাসনে পরিবর্তন হয়নি

এর বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষের সুযোগ নিয়ে 'পরিবর্তন'-এর আওয়াজ তুলে সরকারে ক্ষমতায় বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর তৃণমূলও একই পথ অনুসরণ করছে। পার্থক্য হচ্ছে, সিপিএম রেখেঢেকে যা করত, একটা দলীয় নিয়ন্ত্রণ থাকত, তৃণমূল নগ্ন, খোলাখুলি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তাই করছে। চিটফান্ডের নামে জালিয়াতি শুরু হয়েছিল সিপিএম শাসনেই। তৃণমূল শাসনে তা চরম রূপ নেয়। লক্ষ লক্ষ

মানুষ প্রতারিত, নিঃস্ব। এই লুয়ে তৃণমূলের নেতারা যুক্ত, এ কথা স্পষ্ট। কিন্তু সরকার নীরব। প্রতারিত সাধারণ মানুষের টাকা ফেরতের কোনও ব্যবস্থা তৃণমূল সরকার করেনি। তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, প্রোমোটারির দাপট সবই চলছে অবাধে। শিক্ষায় সরকারি হস্তক্ষেপ, দলবাজি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা হরণ বেপরোয়াভাবে চলছে, স্কুলশিক্ষায় পাশফেল ফেরানোর প্রশ্নে তৃণমূল দ্বিচারিতা করছে। তারা মুখে বলছে পাশফেল ফেরাতে চায়, কিন্তু কেন্দ্রিয় আইন সংশোধিত হওয়ার পরও রাজ্য সরকার নিষ্ক্রিয়। তৃণমূল শাসনেও কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। মালিকার ইচ্ছামত কলকারখানায় লকআউট করে শ্রমিকদের পথে বসাচ্ছে। সিপিএম সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির কথা বলে মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দিয়েছিল। সেই পথেই হেঁটে তৃণমূল সরকারও গ্রামে গ্রামে আরও অধিক মদের দোকান খুলতে দিচ্ছে, যা সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করছে, নারী নির্যাতন, নারীধর্ষণ বাড়াচ্ছে এইরাজ্যে। এখন যত্রতত্র খুন হচ্ছে এবং রাজ্য নারী পাচারে ও নারী ধর্ষণে শীর্ষস্থানে আছে। এই হচ্ছে তৃণমূল ঘোষিত 'পরিবর্তনের শাসন'। এর সুযোগ নিয়ে আর কেন্দ্রীয় সরকারী প্রশাসন ব্যবহার করে ও অঢেল টাকা ঢেলে বিজেপিও মাথাচাড়া দিচ্ছে।

আজ অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিভক্ত হয়ে এক অংশ বিজেপিকে, অপর অংশ কংগ্রেসকে মদত দিচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় পুঁজির সাথে আঞ্চলিক পুঁজির দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে এবং তার ফলে আঞ্চলিক পুঁজিবাদী দলগুলিও শক্তিশালী রূপে দাঁড়িয়েছে। দেশের পুঁজিপতিদের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির শক্তিশালী সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে উঠতে পারত, যদি সিপিএম, সিপিআই সেই সংগ্রাম-আন্দোলনের রাস্তায় যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দল বারবার বলা সত্ত্বেও তারা সেই পথে না গিয়ে দিল্লির কৃষক সমাবেশে রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্য বুর্জোয়া নেতাদের হাজির করাল। কংগ্রেস শাসনে কি কৃষকরা আত্মহত্যা করেনি? কৃষকদের বিক্ষোভে গুলি চলেনি? এই ধরনের সুবিধাবাদী রাজনীতির দৌলতে ২/৫টা এমএলএ/এমপি-র আসন হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে যাওয়া বামপন্থী আন্দোলন আরও দুর্বল হবে। বামপন্থার নামে এইসব সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চা আমরা করি না। আপনারা দেখেছেন, অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মত সিপিএম, সিপিআই, নকশালদের বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম ব্যাপক প্রচার দেয়। ওদের জমায়েত ছোট হলেও বড় করে দেখায়, যাতে লোকে ওদের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী গণ্য করে বিভ্রান্ত হয়। বুর্জোয়ারা ওদের আর্থিক সাহায্যও দেয়। ইলেকশন কমিশনের হিসাবেই পাবেন। আর আমাদের দল রাস্তায় রাস্তায়, ঘরে ঘরে ফান্ড কালেকশন করে চলে। আমরা কত আন্দোলন করি, বড় বড় সমাবেশ, মিছিল করি - বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমে এ খবর থাকে না।

দেখবেন, আজকের টাটানগরের এই বিশাল সমাবেশের খবরও পাওয়া যাবে না, বড় জোর টাটানগরে আঞ্চলিক কিছু প্রচার হবে। কেন এটা ঘটছে? কারণ ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণি জানে, এস ইউ সি আই (সি)কে টাকা দিয়ে কেনা যায় না, এরা গদির লোভে ছোটে না। এই দল পুঁজিবাদের পক্ষে বিপজ্জনক, দুশমন। এই দল পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী শক্তি। এই দলের শক্তিবৃদ্ধি ওদের পক্ষে আতঙ্কজনক। বুর্জোয়ারা চায়, ওদের প্রচারমাধ্যম চায়, কমিউনিস্ট হিসাবে, বামপন্থী হিসাবে জনগণ সিপিএম, সিপিআই, নকশালদের জানুক, তাহলে ওদের বিপদ নেই। এখানে লেনিনের একটি মহান শিক্ষা উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন, "মার্কসবাদ জিন্দাবাদ, কমিউনিজম জিন্দাবাদ" বললেই বিশ্বাস করবে না, তাদের ভূমিকা দেখ, চরিত্র দেখ। যেমন তিনি মহান এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদী অধঃপতন দেখে সম্পর্ক ছিন্ন করে আলাদা তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করেছিলেন, একই কারণে রাশিয়ায় মার্কসবাদী বলে পরিচিত আর এস ডি এল পি থেকে বেরিয়ে এসে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিক দল গঠন করেছিলেন।

সঙ্কটজর্জরিত পুঁজিবাদ জনগণের উপর নির্মম শোষণের স্টীম রোলার চালাচ্ছে

কমরেডস ও বন্ধুগণ, গোটা বিশ্বেই আজ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের প্রবল সংকট চলছে। শোষণে শোষণে জর্জরিত মানুষ, তাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই, বাজার নেই। বিশ্বে পুঁজিবাদের ইঞ্জিন বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবছে। সে-ই এক সময় বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনের হোতা ছিল, এখন বলছে বিশ্বায়ন চাই না। বলছে, আমেরিকা ফার্স্ট, তার স্বার্থই আগে দেখতে হবে। কারণ সেই দেশে কোটি কোটি বেকার, চাকরি নেই। কিছু দিন আগে বিশাল ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে টক্কর দিচ্ছে আজকের সাম্রাজ্যবাদী চিন, যেখানে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া টক্কর দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া, সেখানেও একইভাবে সমাজতন্ত্র ধ্বংস করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর সাম্রাজ্যবাদী জাপান এবং ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ। এরা সবাই বাজার সঙ্কটে জর্জরিত। সকলেই চাইছে অন্য দেশের বাজার গ্রাস করতে, কিন্তু নিজের বাজারে অপরকে ঢুকতে দেবে না। ফলে বাণিজ্যিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সকলেই বিপুলভাবে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে। এই বাজারের দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধেছিল। এবার ট্রেড ওয়ার শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই উদ্বেগের বিষয়। আরেকটা বিষয়ও লক্ষণীয়, যে পুঁজিবাদ শিল্পবিপ্লবের যুগে জাতীয় বাজার সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছিল, জাতীয় স্বার্থের

স্লোগান তুলেছিল, সে পরবর্তীকালে একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে মাল্টিন্যাশনাল বা বহুজাতিক সংস্থার জন্ম দিয়েছে। এরা এখন জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যে দেশেই সস্তায় শ্রমিক ও কাঁচামাল পায়, সেখানেই ছুটছে, সেখানেই পুঁজি ইনভেস্ট করে সেখানে উৎপাদিত পণ্য নিজের দেশেও এক্সপোর্ট করে বেশি মুনাফা করছে। ফলে আমেরিকার মাল্টিন্যাশনালদের নিজস্ব আরও মুনাফার স্বার্থ ও মার্কিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্র গ্লোবালাইজেশনের বিপক্ষে আর মার্কিন মাল্টিন্যাশনালরা তার পক্ষে। অন্যান্য দেশেরও অবস্থা তাই। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মাল্টিন্যাশনাল ও কর্পোরেট সেক্টররাও দেশে না করে বিদেশে পুঁজি ইনভেস্ট করছে। পুঁজিপতিরা আজ জনগণ, দেশ, জাতি— কোনও স্বার্থই দেখে না, যেখানেই বেশি লাভ পাবে সেখানেই ছুটবে। আবার প্রয়োজনে নিজের রাষ্ট্রকেও ব্যবহার করবে। গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদ চরম মন্দার মধ্যে ধুঁকছে। ভারতের অবস্থাও ঠিক তাই। পুঁজিবাদ থাকলে এই মন্দার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। কারণ পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি অনিবার্য ভাবেই বাজার ধ্বংস করছে, ক্রমসংকুচিত করছে। যেখানে কোটি কোটি মানুষ বেকার, ছাঁটাই হয়ে আছে, রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হচ্ছে, সেখানে ক্রয়ক্ষমতা কোথায়? ফলে মন্দা বাড়বেই। আজ পুঁজিবাদের প্রয়োজন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, সেজন্য প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা নৃশংস শ্রমিক শোষণ। আগে ছিল জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন, যাকে বলা হত ডিমান্ড ড্রাইভেন ইকনমি। এখন সেই চাহিদা নেই, তাই কৃত্রিমভাবে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জনগণকে ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাপক লোন দেওয়া হচ্ছে, যাকে বলা হয় ক্রেডিট ড্রাইভেন ইকনমি। এতে জনগণের ওপর ঋণের বোঝা বাড়ছে, শোধ করতে পারছে না। ব্যাঙ্কগুলোও ফতুর হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া শিল্পপতিরাও ব্যাঙ্কগুলি থেকে টাকা লুটছে। সব দেশেই সরকারি বাজেটে ঘাটতি, এই পুঁজিবাদী সরকারগুলি ব্যাপক ঋণ নিয়ে পুঁজিপতিদের ও ব্যাঙ্কগুলিকে সাবসিডি দিচ্ছে, কনসেশন দিচ্ছে, বাজেট ঘাটতি পূরণ করছে আর বিপুল নোট ছাপাচ্ছে, জনগণের উপর আরও ট্যাক্সের বোঝা চাপাচ্ছে, তাতে মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ছেই। সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী সরকারের মত ভারত সরকারও বিপুল ঋণগ্রস্ত।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে সামন্ততন্ত্রের গর্ভজাত যে পুঁজিবাদ তার কৈশোর যৌবনে অত্যাচারী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানধর্মী চিন্তা, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবতাবাদ, সাম্য-মৈত্রি-স্বাধীনতার পতাকা বহন করে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিল, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সেই পুঁজিবাদই একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উপনীত হয়ে সেই পতাকাকে পদদলিত করে পার্লামেন্টারি ঠাটবাটের আবরণে ফ্যাসিস্ট অটোক্র্যাসি গড়ে তুলেছে। যখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ধ্বংস করে একচেটিয়া

পুঁজিবাদী স্তর আসেনি, তখন বহু পুঁজিপতিদের প্রয়োজনে মাল্টি পার্টি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি এসেছিল, কিন্তু আজকের দিনে একচেটিয়া পুঁজির স্তরে সেটা কার্যত 'টু পার্টি ডেমোক্রেসি'তে পরিণত হয়েছে। প্রথম যুগে লেজিসলেটিভ, জুডিসিয়ারি ও এগজিকিউটিভের মধ্যে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ছিল, পুঁজিবাদ তাকেও ধ্বংস করছে, একইভাবে আক্রমণ করছে মতপ্রকাশ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর। মুনাফার লালসা চরিতার্থ করতে শুধু কোটি কোটি মানুষকে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাই নয়, দুইবার বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, পরদেশ আক্রমণ, স্থানীয় যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিকদের সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটিয়ে বায়ুমন্ডল দূষিত করছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, মেরু অঞ্চলের বরফ ধ্বংস করে সমুদ্রের আগ্রাসী বিস্তার ঘটিয়ে স্থলভাগকে বিপন্ন করছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি সহ সভ্যতার সকল সম্পদকে ধ্বংস করছে। এই পুঁজিবাদ মানবজাতির চরম শত্রু। সুদূর অতীতে বর্বর যুগে মানুষ মানুষকে খেত যাকে ক্যানিব্যালিজম বলা হয় ইতিহাসে, আজকের পুঁজিবাদ মানবসভ্যতাকে গ্রাস করছে, ফলে মডার্ন ক্যাপিটালিজম মডার্ন ক্যানিব্যালিজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পুঁজিপতি-শ্রমিক সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে, মুনাফা লুণ্ঠন ও শ্রমিক শোষণ বজায় রেখে, ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে জনজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার কোনও সমাধান হবে না। এজন্যই চাই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রই জনগণকে শোষণ থেকে মুক্ত করেছে

এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে সমাজতন্ত্র। ১৯১৭ সালে মহান নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়েছে যথার্থ পথ কোথায়। ৭০ বছর সমাজতন্ত্র ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নে শোষণ, বেকারিত্ব বলে কিছু ছিল না, ছাঁটাই বলে কিছু ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিনামূল্যে শিক্ষা-চিকিৎসা ছিল। স্বল্প মূল্যে বাড়ি ভাড়া মিলত। সোভিয়েত ইউনিয়নে একমাত্র শ্রমিক-কৃষকরাই ভোটে দাঁড়াতে পারত। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তির অবসান ঘটিয়েছিল, নরনারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধতা ও মৈত্রি স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা জয়যুক্ত হতে সাহায্য করেছিল, বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করেছিল। বহু দিক থেকে তারা অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছে মার্কসবাদ কী করতে পারে, সমাজতন্ত্র কী করতে পারে। এই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা তাই রমাঁ রল্যাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, নজরুল, সুভাষচন্দ্র সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। তাঁরা এই নতুন সভ্যতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। মহান স্ট্যালিন ও

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম কত কুৎসা রটাচ্ছে, সেই স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখে ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ চিত্তে লিখেছেন, " ... মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দচিত্ত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড এক বিপ্লবের ওপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে। ... প্রার্থনা আপনি জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।"[২১] ফাঁসীমঞ্চে আত্মাহুতির পূর্বে শহীদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং তাঁর সহযোদ্ধা শুকদেবকে ভরসা দিয়ে লিখেছিলেন, "তুমি ও আমি বাঁচতে না পারি, কিন্তু আমাদের জনগণ বেঁচে থাকবে। মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের আদর্শ অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।"[২২] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আইএনএ বাহিনী পরাস্ত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ২৫ মে সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র থেকে কি ভরসা ও আস্থা নিয়ে নেতাজী বলেছিলেন, "আজ যদি ইওরোপের এমন কোনও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন, যাঁহার হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যাস্ত, তবে তিনি হলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করে না করে তাহার দিকে সর্বাধিক উদ্বেগ লইয়া গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকাইয়া থাকিবে ... আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে, তাকে গ্রহণ করার ব্যতীত ইউরোপীয় দেশগুলির বিকল্প অন্য কোন পথ নেই। "[২৩] শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং তো নিজেকে মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। বাইরের সাম্রাজ্যবাদ আর সোভিয়েতের অভ্যন্তরে পরাজিত পুঁজিবাদ— উভয়ে হাত মিলিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। আমরা জানি, এক দিন যখন ধর্ম মহৎ আন্দোলন ছিল, দাসপ্রথার যুগে, সেই সময় ধর্মের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। প্রত্যেকটি ধর্ম দাবি করত তারা ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান। হিন্দু ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেকটি ধর্ম কখনও এগিয়েছে কখনও পিছিয়েছে। কখনও পরাস্ত হয়েছে কখনও জয়লাভ করেছে। নবজাগরণ থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সময়কাল ধরলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতিহাস সাড়ে তিনশো বছরের। আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেও বার বার পরাজয়-জয়ের পথে চলতে হয়েছে। আর সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে লড়তে হয়েছে দাসপ্রথা থেকে শুরু করে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ পর্যন্ত কয়েক হাজার বছরের শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে, কয়েক হাজার বছরের শ্রেণিশোষণকে উচ্ছেদ করেছে ৭০ বছরের সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, এই সময়টা কতটুকু? সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করলেও শোষণমুক্তির প্রয়োজনে পুনরায় সমাজতন্ত্রকে জয়যুক্ত করতে হবে।

ভোটের ফলাফল কে নির্ধারণ করে?

এই যে ভোট হচ্ছে, এ সব কি জনগণ ঠিক করছে, ইজ ইট দি ভারডিক্ট অফ দি পিপ্‌ল? বাই দি পিপ্‌ল, অফ দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল? এটা কি যথার্থই জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণেরই? এই যে ভোটে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে— সে টাকা কে দেয়? মালিকরা দেয়। তাদের গোলাম হল বিজেপি, কংগ্রেস ও অন্যান্য আঞ্চলিক দল— যারা ক্ষমতায় বসে মালিকদের চাকরের মতো কাজ করে। ওরা ভোটে প্রচুর টাকা খরচ করছে। এখন ঘরে ঘরে মোবাইল দিচ্ছে, টিভি দিচ্ছে, সাইকেল এবং আরও কত কিছু দিচ্ছে। যদি পাবলিক বলে আকাশের চাঁদ দিন, তবে বলবে, হ্যাঁ তা-ও দেব, আমাদের ভোট দাও। এই যে এত টাকার খেলা, এ কোথা থেকে আসছে? পাবলিকের মানসিক অবস্থাও দাঁড়িয়ে গেছে— আর তো কিছু পাব না, ভোটের সময় যা পাই তাই ভাল। একটা সাইকেল পেলেই হল, একটা টিউবওয়েল কিংবা একটা শাড়ি বা জামা পেলেই হল— অন্তত কিছু তো পাচ্ছি। এই যে কিছু পাচ্ছি, এটা কে দিচ্ছে? এ তো আপনাকে ঘুষ দিচ্ছে। কে ঘুষ দিচ্ছে? দিচ্ছে মালিকরা। যা দিচ্ছে তার কয়েকশো গুণ আপনার থেকে নিচ্ছে শোষণ করে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, ট্যাক্স বাড়িয়ে। এই হচ্ছে কারসাজি। ফলে নির্বাচন একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। ইলেকশন ইজ এ বিগ ডিসেপশন। এটা যে প্রহসন, ভোটের দ্বারা যে সমস্যার সমাধান হয় না, বিপ্লবই যে একমাত্র পথ, এ কথা বোঝানোর জন্য, এ নিয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য আমরা নির্বাচনে নামি এবং নামব ততদিন, যতদিন মানুষ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না হচ্ছে, এটাই হচ্ছে মহান লেনিনের শিক্ষা। বিপ্লবী দল হিসাবে আমাদের শক্তি নিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে আমরা যেমন নানা দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করছি এবং করব, একই ভাবে আমরা নির্বাচনেও লড়ব। আমরা ভোটের সুবিধাবাদী স্বার্থে সিপিএম ও সিপিআই-এর মতো জাতীয় বুর্জোয়া দল ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল ও জাতপাতবাদী পার্টিগুলির হাত ধরাধরি করে জনগণকে ঠকাব না। আমরা বাম-গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলির ঐক্য চাই নীতি-আদর্শভিত্তিক শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের স্বার্থে।

নিজেদের স্বার্থেই জনগণকে সঠিক রাজনীতি চিনতে হবে

কমরেডস ও বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে আবেদন, স্বদেশি আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ঘরের, গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু ক্ষমতা দখল করেছে শোষক শ্রেণি, পুঁজিপতি শ্রেণি। এই সর্বনাশ হল কেন? এ দেশের মানুষ রাজনীতি বুঝতে চায়নি। নেতারাও চেয়েছিল মানুষ অজ্ঞ থাকুক, অন্ধ থাকুক। জনগণও ভেবেছে আমরা মূর্খ মানুষ, রাজনীতি অত বুঝি না, নেতারাই যা হোক ঠিক করুক। এর সুযোগ তারা নিয়েছে। সেদিন মানুষ বুঝতে পারেনি, গান্ধীজির

সাথে নেতাজির পার্থক্য কোথায়? সেদিন মানুষ বুঝতে পারেনি কেন নেতাজিকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। আজও যদি মানুষ অন্ধ থাকে, অজ্ঞ থাকে, আর খবরের কাগজ কী বলছে, টিভি কী বলছে, কে কত টাকা দেবে, এর ভিত্তিতে একে ভোট দেব, তাকে ভোট দেব ভাবে— তা হলে বার বার ঠকতে হবে। এই প্রবচন ঠিক নয়, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। রামায়ণের কাহিনি অনুযায়ী রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান সবাই লঙ্কায় গিয়েছিল, কেউ রাবণ হয়নি। বরং রামায়ণের শিক্ষা হচ্ছে, সীতার সর্বনাশ হত না যদি সীতা রাবণকে চিনতে পারত। রাবণ এসেছিল সন্ন্যাসীর ভেক ধরে। সীতা লক্ষ্মণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করেছিল। আজও ভোটে এই সব নেতারা আসছে এরোপ্লেনে চড়ে, হেলিকপ্টারে চড়ে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরছে, জনগণের জন্য চোখের জল ফেলছে, একে অপরের বিরুদ্ধে চুরি ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে, আর বারবার জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা করছে— আমাদের একবার সুযোগ দিন, আমরা আপনাদের সেবক। আর পিছনে আছে টাকার থলি। পাবলিককে ঠকাবার জন্য আরেকটা চালাকিও করছে। কংগ্রেস যখন সরকারি ক্ষমতায় থাকে, জনগণের মধ্যে আনপপুলার হয়, তখন বিরোধী দল বিজেপিকে 'ত্রাতা' সাজিয়ে ব্যাপক প্রচার দিয়ে ক্ষমতায় বসায়। আবার একইভাবে বিজেপি সরকারি ক্ষমতায় থেকে আনপপুলার হলে কংগ্রেসকে 'ত্রাতা' সাজিয়ে হাজির করে। এই দুই দলই কিন্তু পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত চাকর। এই ষড়যন্ত্রে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না।

জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে। কে শত্রু, কে মিত্র চিনতে হবে। কোন দল শোষক শ্রেণির হয়ে কাজ করছে, কোন দল শোষিত জনগণের হয়ে কাজ করছে, এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। তাই আমি আপনাদের বলতে চাই, মানুষ অনাহারে মরছে, বেকারত্বের জ্বালায়, ছাঁটাইয়ের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পরিবার ভাঙছে, সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, দায়িত্ব অস্বীকার করছে, পণের জন্য স্ত্রীকে হত্যা করছে। হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হচ্ছে, মেয়েরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এ জিনিস চলবে, না এর প্রতিকার চাই? এই প্রতিকারের একমাত্র পথ পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সেই বিপ্লবের পতাকা বহন করছে আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে। তাই আবারও আপনাদের আহ্বান জানাব, আপনারা রাজনীতি বুঝুন, সংঘবদ্ধ হোন। কাগজ রেডিও টিভির পিছনে ছুটবেন না। যারা বারবার ঠকিয়েছে, ঠকাচ্ছে প্রচারের জৌলুসে বিভ্রান্ত হয়ে, সাময়িক প্রলোভনের ফাঁদে জড়িয়ে বারবার ঠকবেন না। বিনা প্রচারেই আমাদের দল বাড়ছে। ২৫ টি রাজ্যের সংগ্রামী প্রতিনিধিরা এসেছেন এখানে। আমাদের কোনও এমএলএ-এমপি নেই, সংবাদমাধ্যমে প্রচার নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার জোরে, আদর্শের জোরে আমাদের হাজার হাজার

কর্মী কাজ করছে, গ্রামে শহরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করছে। আজ প্রয়োজন হাজার হাজার ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খান, প্রীতিলতা— যারা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা বহন করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা শোষিত জনগণকে, বিশেষত ছাত্র-যুবকদের আজকের দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করছি। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা ও মধ্যবিত্তদের দাবিতে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলছি। এই লড়াইয়ে অন্যান্য বামপন্থী দল ও তাদের কর্মীদের সামিল করানোর চেষ্টা করছি। এই দলকে আপনারা শক্তিশালী করুন, মজবুত করুন যাতে আগামী দিনে আমরা আরও শক্তিশালী আন্দোলন করতে পারি, লড়াই করতে পারি। এই লড়াই করতে করতে আমরা ভোটে নামব। আবার ভোটের পরও আমরা লড়াই চালাব। এই লড়াইয়ের শক্তি হিসাবে আগামী নির্বাচনেও আমাদের সমর্থন করুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উদ্ধৃতি সূত্র ঃ

১ - স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশন
২ - ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা - শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড
৩ - ১৯৭৪ সালের একটি শিক্ষাশিবিরের অপ্রকাশিত ভাষণ থেকে
৪ - বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ
৫ - স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপথন, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম খণ্ড
৬ - মহাকাব্য ও মৌলবাদ - জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম ও খাদ্য
৭ - ঐ
৮ - ঐ
৯ - স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, নবম খণ্ড
১০ - ঐ
১১ - স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, সপ্তম খণ্ড
১২ - স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, তৃতীয় খণ্ড
১৩ - ক্রসরোডস
১৪ - বাঞ্চস অফ থটস - এম এস গোলওয়ালকর
১৫ - ক্রসরোডস
১৬ - শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড
১৭ - ক্রসরোডস
১৮ - স্ট্যালিন - কালেক্টেড ওয়ার্কস, সপ্তম খণ্ড
১৯ - ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত - রণেন সেন
২০ - যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক - শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড
২১ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চিঠিপত্র - ১১ খণ্ড
২২ - ভগৎ সিং - পত্রাবলী
২৩। শঙ্করীপ্রসাদ বসু - সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশানাল প্ল্যান